ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Issue-I, September, 2025, Page No. 256- 262
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.issue.01W.233

সত্যজিৎ রায়ের গল্প: ভৌতিক ভাবনার রূপায়ণ

সুরজিৎ সাহা, *গবেষক, বাংলা বিভাগ, কটন বিশ্ববিদ্যালয়, গুয়াহাটি, অসম, ভারত*

Received: 20.09.2025; Accepted: 27.09.2025; Available online: 30.09.2025
©2025 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

The word 'ghost' fills our minds with excitement, sometimes with fear, sometimes with wonder. Our fear of ghosts has fueled our interest in hearing and reading ghost stories. Whenever we hear a ghost story, a question arises in our minds: do ghosts really exist in the world? Many say that it is entirely an illusion. Fear arises from loneliness in human life; and the concept of the existence of ghosts stems from this fear. Others say that ghosts certainly exist; that's why we feel a shiver down our spine and our minds tremble with fear in haunted houses, crematoriums, cemeteries, and during the dead of night.
Like foreign authors, many in Bengali literature have also written stories about ghosts. Like other writers, Satyajit Ray is an extraordinary artist in writing ghost stories. The ghosts in his stories are full of variety; there is not a trace of monotony. The unbelievable ghosts become extraordinary in Satyajit's stories in a very simple way. He is also exceptional in creating a suitable environment for the ghosts to inhabit. Satyajit Ray has written quite a few ghost stories. However, due to our limited scope, we will attempt to express Satyajit Ray's thoughts on the supernatural through a discussion of three of his stories: 'Abhiram', 'Anathbabur Bhoy', and 'Badur Bibhiskika'.

Keywords: Bengali literature, Satyajit Ray, Short story, Ghost, Fear, Illusion, Haunted, Human.

ভুতুড়ে বাড়ি বা হানাবাড়ি ইংরেজিতে যাকে বলা হয় হন্টেড হাউস এই সম্পর্কে সত্যজিৎ রায়ের গল্পের চরিত্র তারিনীচরণ বাড়ুজ্জে বলেছেন—

> "আমার বিশ্বাস এবং অনেকেরই বিশ্বাস যে মানুষ মরে গেলে ভূত হয়, তখনই যখন মৃত্যুটা স্বাভাবিক না হয়ে হয় অপবাদ জাতীয় কিছু। খুন আত্মহত্যা, বাজ পড়ে মরা, মোটর ক্র্যাশে মরা, জলে ডুবে মরা, হিংস্র জানোয়ারের হাতে মরা, এসব ক্ষেত্রেই মৃত ব্যক্তির আত্মার টেন্ডেন্সি হয় যে তল্লাটে মৃত্যু হয়েছে তারই আশেপাশে ঘোরাফেরা করা যেন সে অকালে প্রাণ হারিয়ে পৃথিবীর মায়া কাটাতে পারছে না।"[১]

ভূত কত রকমের হতে পারে সেই প্রসঙ্গে তারিনী বাড়ুজ্জে বলেছেন—

> "ভূত সচরাচর চার প্রকার। এক অশরীরী আত্মা, যাকে চোখে দেখা যায় না; দুই ছায়া মূর্তি; তিন নিরেট ভূত দেখলে মনে হবে জ্যান্ত মানুষ; কিন্তু চোখের সামনে ভ্যানিশ করে যাবে; আর চার নরকঙ্কাল যদিও সে কঙ্কাল চলে ফিরে বেড়ায় এবং কথা বলে।"[২]

এই কথাগুলো সত্যজিৎ রায় তার গল্পের চরিত্রের মুখ দিয়ে উপস্থাপন করলেও এই ভাবনাটি আসলে তাঁর নিজস্ব। তাই গল্পগুলো লক্ষ করলে দেখা যায় সেখানে ভূতেরাও বৈচিত্র্যে ভরা। তাঁর গল্পে খুব সরলভাবেই অবিশ্বাস্য ভূতেরা অসাধারণ হয়ে উঠেছে। ভূতদের বাসস্থানের উপযুক্ত পরিবেশের বর্ণনাতেও সত্যজিৎ রায় সিদ্ধহস্ত। তিনি প্রায় কুড়িটির মতো ভূতের গল্প লিখেছেন। কিন্তু আমাদের স্বল্প পরিসরের জন্য তার মধ্য থেকে 'অভিরাম' 'অনাথবাবুর ভয়' ও 'বাদুড় বিভীষিকা' এই তিনটি গল্পের আলোচনার মধ্য দিয়ে সত্যজিৎ রায়ের ভৌতিক ভাবনা প্রাকাশ করার চেষ্টা করব।

সত্যজিৎ রায়ের গল্পের একটি আকর্ষণীয় বিষয় হল ভৌতিক ভাবনা। তাঁর কিছু গল্পে ভৌতিক ভাবনা সরাসরি এসেছে আবার কিছু গল্প আছে যেগুলোতে স্বপ্নের মোড়কে ভৌতিক ভাবনার প্রকাশ ঘটেছে। সরাসরি ভৌতিক রস পরিবেশিত হয়েছে এমন একটি জনপ্রিয় গল্প হল 'অভিরাম'। সত্যজিৎ রায়ের লেখা এক মজার ভূতের গল্প 'অভিরাম'। যেখানে তিনি পাঠকদের জানিয়েছেন যে ভূতেরাও ভূতের গল্প শুনতে পছন্দ করে এই গল্পে দুটি প্রধান চরিত্র শঙ্করবাবু ও অভিরাম। শঙ্করবাবু স্টেট ব্যাংকের কর্মচারী। তিনি বদলি হয়ে এসেছেন কাঞ্চনতলায়। শঙ্করবাবু ভূতকে ভীষণ ভয় করেন তাই তিনি অভিরামকে কাজে রেখেছিলেন। অভিরাম শুধু কাজের লোক নন শঙ্করবাবুর সঙ্গীও। অভিরাম শঙ্করবাবুকে রোজ গল্প শুনাতো ফলে তাদের মধ্যে একটা আন্তরিকতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে। প্রত্যেকটি মানুষের অন্তরে লুকিয়ে থাকে একটি শিশুসুলভ মন। শঙ্করবাবুর সেই শিশুসুলভ মনটি গল্প শুনতে ভালোবাসে। অভিরাম তার ছোটবেলায় দিদিমার মুখে উড়িষ্যার রূপকথা ও উপকথার যে গল্প শুনেছে সেই সব গল্পই শঙ্করবাবুকে শুনাত। আসলে শিশু মনের কোনও উচ্চ নীচ ভেদ নেই, শিশু মনের কোনও সীমা নেই। তাই উড়িষ্যার রূপকথা ও উপকথা কলকাতার বাঙালি শঙ্করবাবুর শিশুমনের কাছে প্রিয়। কিন্তু শঙ্করবাবু ভূতের গল্প শুনতে ভয় পেতেন। তাই অভিরাম যখনই ভূতের গল্পের প্রসঙ্গ তুলত তিনি তাকে থামিয়ে দিতেন। অভিরাম শঙ্করবাবুকে বলেছিল—

> "যদি কোনও দিন মনে হয় ভূতের ভয় কাটে উঠতে পেরেছেন তো আমায় বলবেন, তখন আমি আপনাকে ভূতের গল্প শোনাবো।"[৩]

এই গল্পে সত্যজিৎ ভূত ও বাস্তবতার মধ্যে সম্পর্ককে তুলে ধরেছেন এই গল্পের মাধ্যমে তিনি বোঝাতে চেয়েছেন যে ভূত বলে কিছু আছে কিনা তা নির্ভর করে ব্যক্তির মানসিকতা ও বিশ্বাসের উপর। গল্পে আমরা দেখি অভিরাম সরাসরি ভূতকে অস্বীকার করে না আবার ভূতকে বিশ্বাসও করে না। সে বলে "ভূত থাকলে আছে, না থাকলে নেই।"[৪] গল্পকার এখানে বলতে চেয়েছেন যে আমাদের ভয় বা বিশ্বাস প্রায়শই আমাদের মনের সৃষ্টি যা বাস্তবতার চেয়ে বেশি শক্তিশালী হতে পারে। তাই গল্পে আমরা দেখি শঙ্করবাবু যখন রেডিওতে শুনতে পেয়েছেন অভিরামের গ্রাম ও তার আশেপাশের অনেকটা অঞ্চলজুড়ে প্রচন্ড ঝড়বৃষ্টি ও বন্যার ফলে হাজার হাজার লোক মারা গেছে তখন তিনি ভীষণ রকম মর্মাহত হন। এই অবস্থায় তিনি কি করবেন ভেবে পাচ্ছিলেন না। রাতে বিছানায় শুয়ে ঘুম আসছিল না।

> "ভূতের ভয়ে এরমধ্যেই তাঁর শিরদাঁড়া দিয়ে ঢেউ খেলে যাচ্ছে।"[৫]

এমন সময়ে তিনি ঘরের বাইরে পায়ের শব্দ শুনতে পান। ভূতের ভয়ে তাঁর গলা যেন শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। ঠিক সেই সময় শুনতে পেলেন আভিরামের কণ্ঠস্বর "বাবু"। আভিরামের কণ্ঠস্বর শুনে শঙ্করবাবু যেন অনেকটা স্বস্তি পেলেন। তারপর তিনি দরজা খুলতে যাবেন ঠিক সেই সময় আবার তিনি শুনতে পান

> "আমি অভিরাম বাবু, কিন্তু আসল আভিরাম নই। আমি অভিরামের ভূত। আমায় বন্যায় টেনে নিয়ে গেছে আমি আর বেঁচে নেই।"[৬]

অভিরাম বাড়ি গিয়ে অপঘাতে মারা গেছে এবং তার দরজার বাইরে অভিরামের ভূত জানতে পেরে ভয়ে শঙ্করবাবু সঙ্গে সঙ্গে হার্টফেল করেছেন। এতে অবশ্য ভালোই হয়েছে শঙ্করবাবু ও অভিরামের বিচ্ছেদের কোনও চিন্তা নেই। শঙ্করবাবু এখন মন ভরে অভিরামের কাছে ভূতের গল্প শুনতে পাবেন। তাই তো মৃত্যুর পর শঙ্করবাবুর ভূত অভিরামের ভূতকে বলেছেন— "আমাকে গল্প শোনাতে পারবি, ভূতের গল্প? কারণ এখন আর ভয় নেই।"[৭] সত্যজিৎ রায়ের 'অভিরাম' গল্পে ভূত আছে যদিও কিন্তু ভয় তেমন একটা নেই। শঙ্করবাবু যতই ভূতের ভয়ে হার্টফেল করুন না কেন পাঠক তাতে আমোদ পেয়েছে।

সরাসরি ভৌতিক রস পরিবেশিত হয়েছে অপর আরেকটি উল্লেখযোগ্য গল্প 'অনাথবাবুর ভয়'। গল্পের শুরুতেই আমরা একজন ভূত বিশেষজ্ঞের উল্লেখ পাই যার নাম অনাথবন্ধু মিত্র। গল্পের কথক ট্রেনে করে রঘুনাথপুর যাচ্ছিলেন হাওয়া বদলানোর জন্য। গল্পকথক খবরের কাগজের অফিসে কাজ করেন। ট্রেনে তাঁর সহযাত্রী হিসাবে ছিলেন অনাথবাবু। গল্পের কথক অনাথবাবুর সঙ্গে কথা বলে জানতে পারলেন তিনিও রঘুনাথপুর যাচ্ছেন। অনাথবাবু সঙ্গে কথোপকথনে গল্পকথক জানতে পারলেন অনাথবাবু একজন ভূত বিশেষজ্ঞ। অনাথবাবু ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে ঘুরে বেড়িয়েছেন ভূতের সন্ধানে। এই অনুসন্ধান তিনি শুরু করেছেন পঁচিশ বছর পূর্বে এবং এখনও অনুসন্ধান চলেছে। তিনি ভারতবর্ষে তিনশোর অধিক পোড়া বাড়িতে নিশুতি রাত কাটিয়েছেন ভূতের সন্ধানে কিন্তু এই পর্যন্ত তিনি ভূতের সাক্ষাৎ পাননি। তবে নিজের চোখে ভূত না দেখলেও দুইবার ভুতের উপস্থিতি তিনি অনুভব করেছেন।

ভূতের গল্পের একটি বড় বৈশিষ্ট্য হানাবাড়ি। প্রায় ভূতের গল্পে একটি ভুতুড়ে বাড়ির উল্লেখ পাওয়া যায় সব দেশের ভূতের গল্পের লেখকরা তাঁদের গল্পে ভুতুড়ে পরিবেশ সৃষ্টির জন্য হানাবাড়ির প্রসঙ্গ নিয়ে আসেন। আমরা আলোচ্য গল্পেও একটি ভুতুড়ে বাড়ির উল্লেখ পাই সেটা হল রঘুনাথপুরের হালদার বাড়ি। গল্পের কথক রঘুনাথপুরে কুণ্ডবাবুর দোকানে দুইজন লোকের কথোপকথন থেকে জানতে পারেন হালদার বাড়িতে ভূতের উপস্থিতি রয়েছে। দুইজন ব্যক্তির একজন বলেছেন—

> "আমারই বন্ধু আমারই সঙ্গে মাত্র দশ টাকা বাজি ধরে রাত কাটাতে গেল ওই উত্তর পশ্চিমের ঘরটাতে। পরদিন ফেরে না ফেরে না ফেরে না শেষটায় আমি জিতেন বক্সী হরিচরণ সা আর আরও তিন চার জন কে ছিল ঠিক মনে নেই বেলুন হালদার বাড়িতে হলধরের খোঁজ করতে। গিয়ে দেখি বাবু ওই ঘরের মেঝেতে হাত পা ছড়িয়ে মরে কাঠ হয়ে আছে, তাঁর চোখ চাওয়া দৃষ্টি কড়িকাঠের দিকে। আর সেই দৃষ্টিতে ভয়ের যে নমুনা দেখলুম, তাতে ভূত ছাড়া আর কি ভাবব বলুন? গায়ে কোন ক্ষতচিহ্ন নেই, বাঘের আচ নেই, সাপের ছোবল নেই, কিছু নেই।"[৮]

গল্পকার গ্রামের লোকের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে গল্পের মধ্যে একটি ভৌতিক আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন। এই কথোপকথন থেকে গল্পকথক যে ধারণাটি করেছেন ঠিক একই রকম ভাবনা গল্পের পাঠকের অন্তরেও ধ্বনিত হয়। গল্পকার পাঠকদের জানিয়েছেন হালদার বাড়ি সম্পর্কে গ্রামের সকলের মধ্যে একটি জনশ্রুতি প্রচলিত আছে যে হালদার বাড়ি হল একটি ভুতুড়ে বাড়ি। গ্রামের মানুষদের কথোপকথন থেকে গল্পের কথকের হালদারবাড়ি সম্পর্কে যে ধারণাটি হয়েছিল তা হল—

> "রঘুনাথপুরের দক্ষিণ প্রান্তে হালদার বাড়ি বলে একটি দুশো বছরের পুরনো ভগ্ন প্রায় জমিদারি প্রাসাদ আছে। সেই প্রাসাদে বিশেষ করে তার দোতলার পশ্চিম কোণের একটি ঘরে না কি অনেক কালের পুরনো একটি ভূতের আনাগোনা আছে। অবশ্য সেই ত্রিশ বছর আগে ভবতোষ মজুমদারের বন্ধু হলধর দত্তের মৃত্যুর পর আজ অবধি নাকি কেউ সে বাড়িতে রাত কাটায়নি। কিন্তু তাও রঘুনাথপুরের বাসিন্দারা ভূতের অস্তিত্ব মনেপ্রাণে বিশ্বাস করে বেশ একটা রোমাঞ্চ অনুভব করে।"[৯]

এখানে গ্রামের মানুষেরা যদিও হালদার বাড়িতে ভূতের উপস্থিতি বিশ্বাস করেন কিন্তু নিজের চোখে ভূতকে কেউ কোনোদিন দেখেনি।

গল্প কথকের মতো অনাথবাবুও পাশ থেকে গ্রামের মানুষদের হালদার বাড়ি সম্পর্কে ভুতুড়ে কথাবার্তা শুনছিলেন। দুজনের মনেই হালদার বাড়ি সম্পর্কে কৌতূহল জন্মায় এবং তাঁরা সিদ্ধান্ত করেন হালদার বাড়িটা একটু দেখে আসবেন। এ গল্পের মধ্যে ভুতুড়ে বাড়ির রহস্য ও অতিপ্রাকৃত বর্ণনার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের মনের ভয় এবং আতঙ্ককে গল্পকার ফুটিয়ে তুলেছেন। পাঠকের মনে ভয়ের ভাবকে বজায় রাখার জন্য হালদার বাড়ির বর্ণনাতেও গল্পকার পাণ্ডিত্য দেখিয়েছেন। হালদারদের বাড়িটা দূর থেকে স্পষ্টভাবে দেখা যায় না, কারণ বাড়ির চারপাশ দিয়ে বড়ো বড়ো গাছের জঙ্গল হয়ে গেছে। তবে বাড়ির গেটের মাথাটা দেখা যেতে থাকে সেই বাড়িতে পৌঁছানোর প্রায় দশ মিনিট আগে থেকেই। বিরাট ফটক মাথার উপর ভগ্নপ্রায় নহবতখানা। ফটকের ভিতর দিয়ে বেশ কিছুদূর যাওয়ার পর আসে সদর দালান। সেখানে দু-তিনটে মূর্তি আর ফোয়ারার ভগ্নাবশেষ রয়েছে দেখে মনে হয় যে বাড়ির আর ফটকের মাঝখানের এই জায়গাটা আগে হয়তো বাগান ছিল। বাড়িটি অদ্ভুত। কারুকার্যের কোন বাহার নেই তার কোনও জায়গায়। কেমন যেন একটা বেঢপ চৌকো চৌকো ভাব। বাড়ির দেওয়াল গুলোতে শেওলা পড়ে গেছে।

গল্পকার এখানে হালদার বাড়ির যেভাবে বর্ণনা করেছেন, তাতে পাঠকের মনে এই ভুতুড়ে বাড়ি সম্পর্কে কৌতূহল বাড়িয়ে তোলে। এরপর গল্পের কথক ও অনাথবাবু যেভাবে সেই বাড়িতে প্রবেশ করেন সেই বর্ণনা পাঠকের মনে আরও বেশি রোমাঞ্চ জাগিয়ে তোলে সেই সঙ্গে প্রকট করে তোলে ভৌতিক আবহ।

রঘুনাথপুরের এই হালদার বাড়িটি যে একটি ভুতুড়ে বাড়ি সেটা অনাথবাবু আগে থেকেই জানতেন এবং এই হালদারবাড়ির ভূতকে তিনি নিজ চোখে দেখবেন বলেই রঘুনাথপুরে এসেছেন। তিনি গল্প কথককে জানিয়েছেন দীর্ঘ পঁচিশ বছর ধরে গবেসবা করে এখন আমি ভূত সম্পর্কে একজন বিশেষজ্ঞ। শুধু ভূতই বা বলছি কেন প্রেত, পিশাচ, ভ্যাম্পায়ার, ওয়ার ডাকিনী, যোগিনী, উলফ প্রভৃতি যা কিছু আছে তার সম্বন্ধে এবং তার বাইরেও সমস্ত লেখা পড়া হয়ে গেছে। ভূত সম্পর্কিত বিভিন্ন ভাষায় লেখা পড়ার জন্য সাতটা ভাষা শিখতে হয়েছে। অনাথবাবুর এরূপ কথা শুনে তাঁর প্রতি গল্প কথকের বিশ্বাস ও শ্রদ্ধার ভাব জেগে ওঠে।

অনাথবাবু গল্পকথককে বলেছেন— "ভূত আমায় ফাঁকি দিয়েছে। হয়তো ভূতকে যারা চায়না ভূত তাদের কাজেই আসে। আমি বারবার হতাশ হয়েছি।"[১০] অনাথ বাবুর এরও বলার কারণ তিনি তিনশোর বেশি ভুতুড়ে বাড়িতে রাত কাটিয়েও, এই পর্যন্ত কোনো ভূতকে নিজের চোখে দেখতে পাননি। তিনি জব্বলপুর, কার্শিয়াং, চেরাপুঞ্জি, কাঁথি, কাটোয়া, যোধপুর, আজিমগঞ্জ, হাজারিবাগ, সিউড়ি, বারাসাত ইত্যাদি নানা জায়গায় ঘুরেছেন ভূতের সন্ধানে কিন্তু কোথাও ভূতকে দেখতে পাননি। তিনি বলেন মাদ্রাজে ত্রিচিনপল্লীতে দেড়শ বছরের পুরনো একটা সাহেবদের পরিত্যক্ত ক্লাব বাড়িতে ভূত অনেকটাই তাঁর কাছাকাছি এসেছিল। সেই অভিজ্ঞতার কথা অনাথবাবু গল্প কথককে জানিয়েছেন—

> "অন্ধকার ঘর একফোঁটা বাতাস নেই যতবারই মোমবাতি ধরার বলে দেশলাই জ্বালাচ্ছি ততবারই কে যেন ফু দিয়ে নিভিয়ে দিচ্ছে। শেষটায় তেরোটা কাঠি নষ্ট করার পর বাতি জ্বলল এবং আলোর সঙ্গে সঙ্গেই ভূতবাবাজি সেই যে গেলেন আর এলেন না।"[১১]

অনাথবাবু তাঁর ভূত বিষয়ক আরও একটি অভিজ্ঞতার কথা জানিয়েছেন। কলকাতার কামাপুকুরের একটি হানাবাড়িতে অনাথ বাবুর মজার অভিজ্ঞতা হয়েছিল। এই হানাবাড়িতে ভূতের অপেক্ষায় থাকতে থাকতে মধ্যরাতে হঠাৎ মাথায় মশা কামড়ালে মাথায় হাত দিয়ে দেখেন একটি চুলও নেই একদম মসৃণ সম্পূর্ণ মাথা জোড়া টাক। তিনি ভেবেছিলেন যে সেটা কি অন্য কারো মাথা, কিন্তু মশার কামড় তিনি নিজেই উপলব্ধি করেছিলেন। তারপর টর্চ জেলে আয়নায় দেখেন টাকের কোন চিহ্নমাত্র নেই ভূতের গল্প বলতে বলতে গল্পকার তার মাঝে একটু হাসির উপাদান যুক্ত করে দিয়েছেন। আসলে গল্পকার যেহেতু তাঁর কিশোর পাঠকদের কথা মাথায় রেখে গল্প লিখেছেন তাই ভৌতিক আতঙ্ককে কিছুটা লঘুভাবে প্রকাশ করার জন্যেই এরূপ উপাদানের সংযোজন করেছেন। গল্পকথক বলেছেন ভূতের নেশাটি সংক্রমক তাই অনাথবাবুর প্রস্তাবে তিনি দ্বিধাহীনভাবে হালদার বাড়ি এসেছেন। গল্পকথক ও অনাথবাবু একে অপরের সঙ্গে কথা বলতে বলতে হালদার বাড়ির সদর দরজায় চলে আসেন। এরপর গল্পকথক ও অনাথবাবু ধীরে ধীরে সেই বাড়ির ভেতরে প্রবেশ করেন। হালদার বাড়ির সেই ভুতুড়ে ঘরটিতে যাওয়ার পথের যে বর্ণনা করেছেন গল্পকার তা পাঠকের শরীরে শিহরণ সৃষ্টি করে। এরপর দুজনে গিয়ে সেই ভুতুড়ে ঘরে প্রবেশ করেন। ঘরটি দেখতে স্বাভাবিক ছিল। দেখে মনে হয় একসময় সেই ঘরটি বৈঠকখানা ছিল। তবে ঘরের সবকিছু স্বাভাবিক মনে হলেও সেই ঘর থেকে একটি অস্বাভাবিক গন্ধ আসছিল। গন্ধটি সম্পর্কে অনাথবাবু বলেছেন— "মাদ্রাজি ধূপ, মাছের তেল আর মরাপোড়ার গন্ধ মেশানো একটা গন্ধ"[১২] আর গল্পকথক অনুভব করলেন বন্ধ ঘর অনেকদিন পর খুললে যে ভ্যাপসা গন্ধ বের হয় ঠিক তেমন।

অনাথবাবু বলেন সেই গন্ধটি তাঁর চেনা। এই গন্ধ তিনি পূর্বেও অনুভব করেছেন এবং তিনি নিশ্চিত যে হালদার বাড়িতে ভূত আছেই। তবে সে দেখা দেবে কি না সেটা রাতে সেখানে থাকলে জানা যাবে। অনাথবাবু স্থির করলেন পরেরদিন তিনি সেই ঘরে রাত কাটাবেন। পরের দিন বিকেল বেলায় গল্পকথক অনাথবাবুকে হালদার বাড়ির ফটক পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যান। তারপর দিন সকাল বেলাতে গল্পের কথক অনাথবাবুর খবর নেবার জন্য হালদার বাড়িতে যান। তবে তিনি হালদার বাড়ির বাইরেই অনাথবাবুকে দেখতে পান। তাঁকে দেখে মনেই হচ্ছিল না যে তাঁর রাতে কোনও রকম ভূতের দেখা মিলেছে। তিনি অন্যান্য দিনের মতো সাধারণ মেজাই কথা বলছিলেন। সকালে নিমের ডালের দাঁতন খুঁজতে গেছেন জঙ্গলে, গল্পকথকের আনা চা পান করতে করতে জানিয়েছেন গতরাতে কীভাবে সেই পরিত্যক্ত বাড়িটি জীবন্ত হয়ে উঠেছিল। লেখকের বর্ণনায়—

> “আশ্বিন মাস— সাড়ে পাঁচটায় সূর্য ডুবেছে। দেখতে দেখতে অন্ধকারটা বেশ জমাট বেঁধে উঠল। আর সেইসঙ্গে সেই গন্ধটাও ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠলো। আমি এমনিতে খুব ঠান্ডা মেজাজের মানুষ, সহজে বড় একটা এক্সাইটেড হই না, কিন্তু কাল যেন ভিতরে ভিতরে বেশ একটা উত্তেজনা অনুভব করছিলুম।”[১৩]

অনাথবাবু বলেন সময়টা একদম ঠিকভাবে তার মনে নেই। তবে রাত নয়টা কি সাড়ে নয়টার সময় সেই ঘরে একটি জোনাকি এসে প্রবেশ করেছিল। সেটা কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার জানালা দিয়ে বেরিয়ে যায়। তারপর কখন যে শেয়াল ঝিঝির ডাক থেমে গেছে আর তিনি ঘুমিয়ে পড়েছেন সেটার খেয়াল নেই। এরপর হঠাৎ করে ঘড়ির ঢং ঢং শব্দে ঘুম ভেঙ্গে যায়। তখন রাত বারোটা বাজে তার ঘুম পুরোপুরি ভেঙ্গে যাওয়ার পর সজাগ হয়ে তিনি দুটো জিনিস লক্ষ করেছেন সেটা হল—

> “আমি আরাম কেদারায় সত্যিই খুব আরামে শুয়ে আছি। ছেড়াটা তো নেইই, বরং উল্টে আমার পিঠের তলায় কে যেন একটা বালিশ গুজে দিয়ে গেছে। আর দুই আমার মাথার উপর একটি চমৎকার ঝালর সমেত আস্ত নতুন টানাপাখা, তা থেকে একটি নতুন দড়ি দেয়ালের ফুটো দিয়ে বারান্দায় চলে গেছে, এবং কে জানি সে দড়িতে টান দিয়ে পাখাটি দুলিয়ে আমায় চমৎকার বাতাস করছে। আমি অবাক হয়ে এইসব দেখছি আর উপভোগ করছি, এমন সময় খেয়াল হল অমাবস্যার রাত্তিরে কী করে জানি ঘরটা চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। তারপর নাকে এল একটা চমৎকার গন্ধ। পাশ দিয়ে দেখি কে জানি একটা আলবোলা রেখে গেছে, আর তার থেকে ভুরভুর করে বেরোচ্ছে একেবারে সেরা অম্বুরী তামাকের গন্ধ।”[১৪]

এটুকু বলেই অনাথবাবু থেমে যান। অনাথবাবু গল্পকথককে জিজ্ঞেস করেন যে গত পরশু যখন তিনি হালদার বাড়ির সেই ভুতুড়ে ঘরে গিয়েছিলেন, তখন তিনি কড়িকাঠের দিকটায় ভালো করে লক্ষ করেছিলেন কি? গল্পকথক বলেন সেদিন তিনি কড়িকাঠের দিকে ভালোভাবে লক্ষ করেননি। এরপরই অনাথবাবু বলেন তার আর ভূতের অনুসন্ধানে কোথাও যেতে হবে না। আর কোনও দিনও না। অনাথবাবুর সেই শখ মিটে গেছে। এরপরই গল্পে আসে ভৌতিক চমক যা পাঠকদের মধ্যে উত্তেজনা বাড়িয়ে তোলে। গল্পকথক অনাথবাবুর সঙ্গে কথা বলতে বলতে সেই ঘরে গিয়ে প্রবেশ করে দেখেন অনাথবাবু মৃত অবস্থায় ঘরে পড়ে আছেন। হঠাৎ সমস্ত বাড়ি জুড়ে এক অট্টহাসি প্রতিধ্বনিত হতে শুরু করে এই দৃশ্য দেখে গল্প কথক অজ্ঞান হয়ে পড়ে।

আসলে অনাথবাবু রাতে ভুতের দেখা পেয়েছিলেন এবং ভুতের দেখা পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মৃত্যু হয়। গল্পের কথক পরের দিন যে অনাথবাবুর সাক্ষাৎ পেয়েছেন সেটা আসলে অনাথবাবুর ভূত। অনাথবাবু মৃত্যু পরে ভূতে পরিণত হয়েছেন। সত্যজিৎ রায় এই গল্পে কোনও রকম অশরীরী বা কঙ্কাল ভূত নয়, একদম খাঁটি শরীরী ভূতের আগমন ঘটিয়েছেন। তবে সত্যজিৎ রায় গল্পে ভূতকে সশরীরে নিয়ে এলেও তিনি গল্পে কোনও রকম ভৌতিক আতঙ্কের দৃশ্য আনেননি, এরূপ করার একমাত্র কারণ তাঁর গল্পের কিশোর পাঠকের কথা তিনি চিন্তা করেছেন। তাই তো দেখি তার গল্পের ভূত সকালে উঠে দাঁতন খুঁজতে জঙ্গলে গেছেন।

সত্যজিৎ রায়ের ভৌতিক ভাবনা নিয়ে লেখা আরো একটি জনপ্রিয় গল্প হল বাদুর বিভীষিকা। এই গল্পে আমরা একজন গবেষকের ভৌতিক অভিজ্ঞতার বর্ণনা দেখতে পাই। তিনি টেরাকোটার কাজ নিয়ে গবেষণা করেছেন এবং সেই কাজেই তাকে সিউড়িতে যেতে হয়। এই গবেষকের ছিল প্রচন্ড বাদুড় ভীতি। তিনি সিউড়িতে গিয়ে যে বাড়িটিতে উঠেছিলেন সেটি ছিল একটু পুরনো ধরনের। আশ্চর্যের বিষয় ঘরে ঢুকেই তিনি দেখলেন কড়িকাঠে একটি বাদুর ঝুলছে। সেটা দেখে তিনি ভারী বিরক্ত হন তবে তার চাকর এসে বলেন সেটা সন্ধে হলে চলে যাবে। গবেষক আর ঘরে না ঢুকে বারান্দায় বসে চা পান করলেন এরপর বিকেলে সূর্য ডোবার সময় গবেষক দেখলেন সেই বাদুরটি তার কান ঘেঁষে শনশন করে উড়ে চলে গেল। বাদুড় ঘর ছেড়ে যাওয়ায় গবেষক অনেকটাই স্বস্তি অনুভব করলেন এরপর তিনি চারিদিকটা একটু ঘুরে দেখতে বেরোলেন।

গবেষক হাঁটতে হাঁটতে পাশে থাকা গোরস্থানে চলে যান এবং সেখানে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয় একজন অদ্ভুত মানুষের। এই অদ্ভুত মানুষটিকে নিয়েই গল্পে ভৌতিক হতভম্বতার সৃষ্টি হয়েছে। মানুষটি গবেষকের সঙ্গে প্রথম পরিচয় জিজ্ঞেস

করেন “আপনি বাদুর জিনিসটাকে বিশেষ পছন্দ করেন না তাই না?”[১৫] মানুষটির মুখে এই কথা শুনে গবেষক অবাক হয়ে যান তিনি ভাবেন মানুষটি এই কথা জানল কিভাবে। এমনকি মানুষটি গবেষকের মনের কথাও বুঝতে পারেন তাই নিজে থেকেই বললেন গবেষক যখন বাড়ির চাকরকে সেই কথাটা বলছিলেন, তখনই তিনি সেটা শুনেছেন। মানুষটি তার নাম জগদীশ পার্সিভ্যাল মুখার্জি বলে জানিয়েছেন। তিনি গবেষককে বলেন যে সিউড়িতে তারা কয়েক পুরুষ থেকে বসবাস করেন। সেই গোরস্থানে তার বাবা ঠাকুরদার কবর রয়েছে তিনি বলেন প্রত্যেকদিন সন্ধ্যাবেলায় তিনি এই গোরস্থানের চারপাশে ঘোরাফেরা করেন। তিনি গবেষককে এটাও জানান যে অন্ধকারেও তিনি স্পষ্ট দেখতে পান। লেখকের এই সিব কথাবার্তা অতিপ্রাকৃতের আবহ তৈরি করে।

জগদীশ বাবুর ভ্যাম্পায়ার ও বাদুড় নিয়ে একঘেয়ে আলোচনা গবেষক বিরক্তি অনুভব করছিলেন কিন্তু জগদীশ তার পিছু ছাড়ছিলেন না। এই মানুষটি কে বা কী এই কথা গবেষকের মনে বারে বারে ঘুরপাক খাচ্ছিল। তবে এর উত্তর গবেষক ঘুমিয়ে স্বপ্নের মাধ্যমে জানতে পারেন—

> “ঘুমের মধ্যে স্বপ্ন দেখলুম জালনার গরাদে মুখ লাগিয়ে সন্ধ্যাবেলার সেই ভদ্রলোকটি আমার দিকে চেয়ে হাসছেন। তার চোখ দুটো জ্বলজ্বলে সবুজ, আর দাঁত গুলো কেমন যেন সরু সরু আর ধারালো। তারপর দেখলুম ভদ্রলোক দু পা পিছিয়ে গিয়ে হাত দুটোকে উঁচু করে এক লাফ দিয়ে গরাদ ভেদ করে ঘরের মধ্যে এসে পড়লেন। ভদ্রলোকের পায়ের শব্দেই যেন আমার ঘুমটা ভেঙে গেল।”[১৬]

আসলে গবেষক এরূপ স্বপ্ন দেখেছেন তাঁর সেই বাদুর ভীতির জন্য। তার মনের মধ্যে লুকিয়ে থাকা বাদুড়ের প্রতি ভয় ও সচেতনতা থেকেই এরূপ স্বপ্ন তিনি দেখে ছিলেন। এমনকি গবেষক জগদীশবাবুকে বাদুড় বলে ভাবতে শুরু করেন। এর কারণ জগদীশবাবুর কথা ও আচরণে গবেষক বাদুড়ের সঙ্গে অবাস্তব সামঞ্জস্য পেয়েছেন। যেমন তিনি গবেষককে বলেছেন—

> “আমার আবার কি বাতিক জানেন? রাত্রে আমি একদম ঘুমোতে পারি না দিনের বেলাটা কোষে ঘুমিয়ে নিই, আর সন্ধ্যে থেকে সারা রাতটা এদিক ওদিক বেরিয়ে বেড়াই। এই ঘোড়ায় যে কী আনন্দ তা আপনাকে কি করে বোঝাবো।”[১৭]

এই গল্পে সত্যজিৎ রায় মানুষের মনের ভয় অস্বস্তি এবং অতিপ্রাকৃত ঘটনাকে বাস্তবে মিশিয়ে ভৌতিক ভাব প্রকাশ করেছেন। গল্পকার বাদুরের সাধারণ চেহারা এবং চলাফেরা ব্যবহার করে একটি ভয়ের পরিবেশ তৈরি করেছেন। গল্পের শুরুতে কথকের বাদুড়ের প্রতি যে অস্বস্তি এবং ভয় প্রকাশ পেয়েছে, তা ধীরে ধীরে একটি চরম বিভীষিকায় পরিণত হয়। যা গল্পের শেষে এক মর্মান্তিক ও রহস্যময় পরিণতিতে পৌঁছায়।

উপরে উল্লেখিত আলোচনা থেকে আমরা দেখলাম যে সত্যজিৎ রায় তাঁর ভৌতিক গল্প সাধারণ জীবন, পরিবেশ ও চরিত্রকে কেন্দ্র করে গড়ে তুলেছেন। যার মধ্যে অতিপ্রাকৃত ঘটনা ঘটে এবং সাধারণ মানুষের জীবনে ভয়ের সঞ্চার হয়। যার জন্য গল্পগুলো আরও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে। আমরা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি যে, সত্যজিৎ রায় তাঁর গল্পে ভৌতিক ভাবনা প্রকাশে একজন ওস্তাদ শিল্পী। নিপুন দক্ষতায় তিনি গল্পে ভৌতিক রস জাগানোর ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য দেখিয়েছেন গল্পের পটভূমিতে, চরিত্র নির্বাচনে সেখানে একঘেয়েমিতা নেই। পাঠকের মন অতিপ্রাকৃতের বৈচিত্র্যময় আবহে রোমাঞ্চিত হয়। তবে যেহেতু তিনি গল্পগুলো কিশোর পাঠকদের কথা ভেবে রচনা করেছেন তাই তাঁর গল্পে ভৌতিক আতঙ্কের সৃষ্টি করেননি। গল্পগুলি কিশোর মনের উপযোগী করে পারদর্শিতার সঙ্গে পরিবেশন করেছেন।

তথ্যসূত্র:

১. রায়, সত্যজিৎ। ধূমল গড়ের হান্টিং লজ। গল্প ১০১। আনন্দ পাবলিশার্স, প্রথম সংস্করণ মে ২০০১।, দ্বাদশ মুদ্রণ জুলাই ২০১৫, ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন, কলকাতা-০৯, পৃ. ৪১৬ ।
২. তদেব, পৃ. ৪১৭।
৩. রায়, সত্যজিৎ। অভিরাম। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৬৫০।
৪. তদেব, পৃ. ৬৫০।
৫. তদেব, পৃ. ৬৫০।

৬. তদেব, পৃ. ৬৫০।
৭. তদেব, পৃ. ৬৫১।
৮. রায়, সত্যজিৎ। অনাথবাবুর ভয়। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৫০।
৯. তদেব, পৃ. ৫০।
১০. তদেব, পৃ. ৫২।
১১. তদেব, পৃ. ৫২।
১২. তদেব, পৃ. ৫৩।
১৩. তদেব, পৃ. ৫৫।
১৪. তদেব, পৃ. ৫৫।
১৫. রায়, সত্যজিৎ। বাদুড় বিভীষিকা। পূর্বোল্লিখিত, পৃ. ৯৫।
১৬. তদেব, পৃ. ৯৬।
১৭. তদেব, পৃ. ৯৬।